সিডনির সমুদ্র দেখে তাঁর মনে পড়ত কর্ণফুলি নদীর কথা

শ্যুবার্টের সিম্ফনিতে ভেসে আসত চট্টগ্রামের স্মৃতি। ফরাসি স্ত্রীকে নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেছেন অস্ট্রেলিয়ায়, প্যারিসে। লিখেছেন 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো'-র মতো কালজয়ী উপন্যাস। তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বাঙালিদের অন্যতম। আজ তাঁর শতবর্ষের সূচনা। **শুভাশিস চক্রবর্তী**

সিডনির শহরতলি ভাউক্লুসে বাঙালি তরুণটি যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, সেটি পাহাড়ের উপরে। সামনে বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখা যায়। সেখানে বসে তরুণটি শুনতেন শ্যুবার্টের সিম্ফনি। মনে ভেসে আসত চট্টগ্রামের স্মৃতি। যেখানে ১৯২২-এর ১৫ অগস্ট তাঁর জন্ম। মনে পড়ত সেখানকার ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়। রাঙামাটির আনারস ক্ষেত। কর্ণফুলি নদী। নৌকোবিহার। তিনি যে 'কেরায়া' নামে একটি ছোটগল্প লিখেছেন, সেখানে আছে তাঁর পুববাংলার নদীমাখা অভিজ্ঞতার ধারাবিবরণ— 'বাইরে নির্মেঘ আকাশ উপুড়-করা রোদে উজ্জ্বল মোহিনী সাপের মতো হয়ে ওঠে। ...অবশেষে সূর্য যখন রক্তিম রূপ ধারণ করে, পৃথিবীতে ছায়া নাবে, নম্রতা আসে, সে-নির্লজ্জ সাপ তখন আবার নদীতে পরিণত হয়। ...তারপর নৌকাটি সুপরিচিত বাঁক পেরুলে এবার গ্রামটি নজরে পড়ে। দিগন্তে একমুঠো ছায়ার মতো দেখায় সে-গ্রাম।" আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে, বয়স যখন তাঁর পঞ্চাশ, তাঁর জন্মভূমির নতুন নাম হবে 'বাংলাদেশ', ঠিক তখনই যদি তাঁর অকালমৃত্যু না হত, তবে তিনি ফিরে আসতেন ওই নদীটির পাড়ে, যেখানে 'সঙ্কীর্ণ রাঙাপথ ছেড়ে কাজলী নদীর ধারে-ধারে বরফ-কণার মতো সাদা ঘাসফুল পায়ে মাড়িয়ে ওরা দু'জন হাঁটছিল...'

সেই তরুণের স্মৃতিপথে ফিরে আসে কলকাতা, কৃষ্ণনগরের অমলিন কথকতাগুলিও। আব্বার বদলির চাকরি। পড়তে হয়েছে অনেক স্কুলে, কলেজে। ১৯৪১-এর শীতার্ত বর্ষশেষের কোনও এক দিন। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে সে দিন আবশ্যিক বাংলার ক্লাস নিচ্ছিলেন অধ্যাপক। প্রিয়দর্শন, ঋজু, দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ ছাত্রটির মন নেই সেই

প্রতিভা: সাহিত্য ছাড়াও সংস্কৃতির বহু শাখায় কৃতী ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্

একঘেয়ে বক্তব্যে। বহু শিক্ষার্থীর আড়ালে এক কোণে মনের সর্বস্ব দিয়ে তিনি এঁকে চলেছেন একটি রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি। মাত্র কয়েক মাস আগে প্রয়াত হয়েছেন কবিগুরু। ধ্যানস্থ অঙ্কনে ঢেলে দিচ্ছেন অশ্রুর আর্তি। ঘটনাটি খেয়াল করেছিলেন সহপাঠী হৃষীকেশ লাহিড়ী। ক্লাস শেষের আলাপচারিতা পৌঁছে গেল খেলার মাঠের সবুজ ঘাসে। মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন তাঁরা। কিন্তু হৃষীকেশ কি জানেন নবপরিচিত এই সহপাঠী ধর্মে মুসলমান? আচমকা রবি-অনুরাগী ছেলেটি বলে উঠলেন: 'আমাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবার আগে আমার যথার্থ পরিচয় আপনার জানবার দরকার। আমি মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। আশা করি আপনি হয় কংগ্রেসকর্মী, নয় কংগ্রেস সমর্থক। এবার আপনি ঠিক করুন আমাদের আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে কিনা।' এই অভাবিত স্পষ্টভাষণ দুই সহপাঠীর বন্ধুত্বের দরজাটিকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিল যেন। কৃষ্ণনগর ছেড়ে যাওয়ার পরে চিঠিপত্রের উষ্ণতায় থাকে হৃদয়ের যোগ। হৃষীকেশ রক্ষা করতে পেরেছেন এমনই চব্বিশটি চিঠি। তার দু'-একটিতে যে 'শ্রীণি'-র কথা আছে, তিনি হয়তো ক্ষণিকের বসন্ত-বাতাস বয়ে এনেছিলেন মেধাবী মুসলমান ছাত্রটির হৃদয়ে, কিন্তু তাঁর সুহৃদ 'ঋষি' অনেক পরেও সে বিষয়ে প্রকাশ্য মন্তব্যে রাজি হননি। পত্রালাপের সময়-পরিসর ন' বছর, ১৯৪২ থেকে ১৯৫১। ঋষিকে আট দশক আগের একটি চিঠিতে লিখছেন— 'বিভিন্ন পত্রিকায় এক সাথে আমাকে ৫/৬ টা গল্প পাঠাতে হচ্ছে। এই যে পাঠাচ্ছি, আর পরীক্ষার আগে কোথাও পাঠাবো না, হাত মুছে ফেলে পড়তে হবে, নইলে পাস করা হবে না ভাই।' সহপাঠী হলেও হৃষীকেশ তখনই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই প্রিয় বন্ধু অন্যদের থেকে পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রতিভাবান গল্পকার। তখনই বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হচ্ছে। 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'চতুরঙ্গ', 'পূর্বাশা', 'পরিচয়'-এর মতো পত্রিকায় তিনি সমাদৃত। এমনই একটি চিঠিতে হৃষীকেশ জানতে পারছেন— 'সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্বাশা পাবলিশিং হাউস আমার একটা বই করছেন। নাম স্থির হয়েছে নয়নচারা।'

মনে পড়ে কলকাতায় যখন তিনি একটি ইংরেজি দৈনিকের সাব-এডিটর, পেয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশের একাধিক চিঠি। ইংরেজিতে লেখা। তাতে কবি পত্রপ্রাপকের নামের বানান বারম্বার ভুল করছেন বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। একটি চিঠিতে আছে পঞ্চাশ টাকা সম্মানদক্ষিণা চেক প্রাপ্তির ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ওই সংবাদপত্রে তিনি চাকরি করেছেন আড়াই বছর।

সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ছবি আঁকেন, চিত্রসমালোচনা করেন। কলকাতার ঠিকানায় যাত্রা শুরু হল তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের— কমরেড পাবলিশার্স। প্রকাশ করলেন হান্টারের 'দ্য মুসলমান', আহসান হাবীবের 'রাত্রিশেষ', রুচিমান